আত্মচেতনার বিকাশই বিশ্ব চেতনা

▣ মিতালী দেব

মানুষ মূলত আত্মকেন্দ্রিক। এই কথাটা ধরে নিয়ে সমাজ ও চেতনার অভিব্যক্তির অনেকটাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই ধরণের সরল চিন্তায় তবু একটা অসম্পূর্ণতা আছে। গতিশীলতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না দ্বান্দ্বিকতার ধারণা ছাড়া। মানবপ্রকৃতির গভীরে একটা দ্বন্দ্ব আছে, আমাদের চিন্তার মূলে তাকে স্থান দিতে হবে।

মানব প্রকৃতির এক মেরুতে আছে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, চেতনায় সেটা সঙ্কুচিত রূপ। অন্য মেরুতে পাই অপরের সঙ্গে যোগস্থাপনের গভীর আকাঙ্ক্ষা, যেখানে প্রকাশ পায় চেতনার সম্প্রসারিত রূপ। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, দুই প্রবৃত্তির মধ্যে আছে একই সঙ্গে বিরোধ ও পরিপূরকতা। এদের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়েই চেতনা গতিলাভ করে, অভিব্যক্তি ঘটে ব্যক্তি চৈতন্যের ও বৃহত্তর সমাজের।

আত্মকেন্দ্রিকতা এবং আত্মার সম্প্রসারণধর্মিতা, দুটি প্রবৃত্তিই যে মানব প্রকৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত, এই কথাটা প্রথমে, মৌল উদাহরণের ভিতর দিয়ে, দৃঢ়ভাবে বুঝে নেওয়া আবশ্যক। এইভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তি। আলোচনার প্রস্থান বিন্দুতে স্থাপন করা যাক কোনও প্রখ্যাত পণ্ডিতের প্রবাদসম বাক্য নয়, বরং চিরপরিচিত জীবনের কিছু সহজ সরল তবু প্রত্যয়ী অভিজ্ঞতা।

প্রকৃতি থেকে পাঠ গ্রহণ করা জ্ঞানার্জনের এক প্রধান উপায়। শৈশবে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ, পরে আর তেমন নয়। শিশুর আচরণ থেকে মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাই কিছু মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। শিশু স্বভাবত আত্মকেন্দ্রিক। নিজের প্রতি নিকটস্থ অন্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তার প্রবল উৎসাহ। বাইরের মানুষের আগমনে সেই মনোযোগে ছেদ পড়লে লক্ষ করা যায় শিশুর তাতে পরিষ্কার আপত্তি। নিজের প্রতি সে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় শুধু খাদ্যের দাবি মেটাতে অথবা অন্য কোনও বাহ্য প্রয়োজনে নয়। নানা প্রয়োজনের ঘোষণা থাকে বটে, সেটা কিন্তু বহু ক্ষেত্রে গৌণ ব্যাপার। এই সবের আড়ালে আছে আত্ম অথবা অস্তিত্বের বিশুদ্ধ স্বীকৃতির জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা মানবপ্রকৃতির এক মূল উপাদান, শিশুর আচরণের ভিতর দিয়ে এই সত্যটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এরই পাশাপাশি আছে মানুষের অন্য এক প্রবৃত্তি, চেতনাকে প্রসারিত করবার বাসনা, ব্যক্তির সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের বাইরে যাদের অবস্থান তাদের সঙ্গে যোগস্থাপনের অদম্য ইচ্ছা। এই ইচ্ছা অবশ্য কিছুটা দেখা দেয় জাগতিক প্রয়োজনে। যেমন, উদ্দেশ্যটা

অপরের, এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের, বিশুদ্ধ যোগের তৃষ্ণা মানুষের এক অন্তর্গত ধর্ম। যোগের এই আকাঙ্ক্ষা মনের কোনও এক স্তরে ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। আর এই কারণেই সাংসারিক বুদ্ধি তাকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি জানাতে অক্ষম। অথচ মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিই যে এখানে অস্বচ্ছ, এমনকী সত্যভ্রষ্ট, একথা সামান্য পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই ধরা পড়ে। যথাসম্ভব সরলভাবে কথাটা তুলে ধরা যাক।

খাদ্য 'বস্ত্র' বাসস্থান এই হল মূল প্রয়োজন, এতেই সাধারণ মানুষের চলে, এমন একটা কথা সংসারে প্রচলিত আছে। সত্যি কি এতে চলে ? মানুষের অন্তরে আছে বিশুদ্ধ যোগের জন্য এক হাহাকার, যাকে উপেক্ষা করলে মন বিধ্বস্ত হয়, একথা কি সত্য নয় ? ধরুণ একটি মানুষকে আবদ্ধ করে রাখা হল সুগঠিত এক নিঃসঙ্গ কক্ষে, যেখানে ভোজনের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে, বস্ত্রেরও অভাব নেই। তাকে কঠিনভাবে বঞ্চিত করা হল শুধু বিশ্বের অন্য সকলের সঙ্গ থেকে। রইল না কোনও দিক থেকেই নিঃসঙ্গতা পেরিয়ে যোগস্থাপনের কোনও ব্যবস্থা, দূরদর্শন নেই, সঙ্গীত নেই ; বইয়ের ভিতর দিয়ে যোগের ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়, অতএব সেটাও নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, রাখা হল নিত্যন্ত শারীরিক প্রয়োজন মেটাবার নিঃশব্দ উপায় ; রাখা হল না মনের সঙ্গে মনের যোগ সাধনের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কিছুমাত্র সুযোগ। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এই অবস্থা হবে অসহনীয়। মৃত্যুদন্ডকে তুলনায় বাঞ্ছনীয় মনে হতে পারে। আসলে মানুষের অহংবোধও এমন নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতায় নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। অন্ন যেমন দেহের খাদ্য যোগের অনুভূতি আত্মার খাদ্য।

চেতনার আছে নানা রূপ, সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত। মিথ্যা বলে কোনওটিকেই অস্বীকার করা চলে না। চেতনা গতিশীল, আত্ম ও বিশ্বের দুই মেরুর ভিতর তার বিচরণ। সংসারের ছোট বৃত্তে আবদ্ধ প্রতিদিনের নির্ধারিত ক্রিয়াকর্ম। তার বাইরে আছে অন্য এক মুক্তির জগৎ। সেই জগতের বাণীও পৌছায় আমাদের কাছে। বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির বিরহ মিলনের সুরে রচিত আমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত।

শিল্প ও সঙ্গীতকে যাঁরা মুক্তির পথ বলে বেছে নিয়েছেন তাঁদেরও একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াতে হয়। শিল্প ও সঙ্গীতের প্রভাব বিষয়ে পৃথিবীর কোনও কোনও প্রধান ধর্ম সন্দিগ্ধ অথবা দ্বিধাগ্রস্ত। এই সন্দিগ্ধতাকে অসহিষ্ণুতা দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা না করে আলোচনার পথে কিছু দূর চলা যেতে পারে। তাতে আর কিছু না হোক নিজের কথাটা নিজে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে শিল্প সাহিত্য ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। আমাদের জীবনদর্শনও এইভাবে

সমৃদ্ধতর হয়।

আলোচনা আবারও কিছু মূল্য কথা দিয়ে শুরু করা যাক। জগতের যেসব বস্তু ও ঘটনা ইন্দ্রিয়ের পথে আমাদের চেতনায় পৌঁছায়, মন তাদের গ্রহণ করে থাকে কিছু আবেগ ও প্রাণরসে কমবেশি জারিত করে। তিন ধরণের রস ও আবেগের কথা এখানে উল্লেখ করব, মনে হয় বর্তমান আলোচনার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট হবে। কিছু আবেগ আসক্তিজাত, যেমন লোভ (যার সঙ্গে যুক্ত থাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা) অথবা ভয় (যার মূলে আছে হারাবার ভয়)। কিছু আবেগ নীতিবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ ভাল-মন্দ হিতাহিত বিভেদ-বিচার দিয়ে রঞ্জিত। এর বাইরে আছে বিস্ময়বোধ, আদি অভিজ্ঞতা অথবা নতুন অনুভূতিতে যেটা প্রধান উপাদান হয়ে থাকে এই সবের মিশ্রণে গঠিত হয় আমাদের জীবন ও জগৎকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি।

সাধু অথবা ধর্মগুরু আমাদের উপদেশ দেন আসক্তিজাত আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে জগতের দিকে তাকাতে। শিল্পীর কাজ মূর্তি গড়া, ভাব অথবা অনুভূতিকে রূপের ভিতর স্থাপিত করা। এই রূপ স্থাপনের কাজের জন্য এক ধরণের অনাসক্তির প্রয়োজন হয়। এই অনাসক্তি ভালবাসার বিপরীতে নয়, বরং এরা পরস্পর সংযুক্ত। শোকগ্রস্ত মানুষের অদম্য উচ্ছসিত বিলাপ কাব্যপদবাচ্য নয়। তাকে বাক্যে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে একটু দূরত্বের দরকার, মৃত্যুশোকের সঙ্গে যে দূরত্ব রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর চেতনায়।

অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন হয় সাধু ও শিল্পী উভয়েরই। তবু দুয়ের ভিতর পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। শিল্পী সুনীতির প্রচারক নন, অন্তত শিল্পী হয়ে উঠবার জন্য ওটা আবশ্যক নয়। নীতিবিষয়ক আবেগের প্রাধান্য শিল্পসৃষ্টির ও শিল্পবিচারের কাজে সহায়ক নয়।

এক বন্ধু আমাকে বলেন, এ দেশের নৈতিক জীবনের ওপর মহাভারতের প্রভাব ভাল হয়নি। ও নিয়ে তর্ক করতে আমি আগ্রহী নই। আমার বিচারে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ হোন বা না হোন, মহাভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। কবিরা সবাই সাধুচরিত্রের নন। তবু মানুষ তাঁদের কাছে ঋণী, যে আনন্দের ভাণ্ডার তাঁরা রেখে গেছেন তারই জন্য ঋণী।

এখানেই কিন্তু একটা গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখা দেয়। মিঠাই খেতে সুস্বাদু, এ কথা জেনেই ময়রা কাজে হাত দেন, তাতে কাজের ক্ষতি হয় না। কাব্যের আস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর, একথা শুনে যদি কেউ কাব্যের প্রতি লুব্ধ হন অথবা কবিতা রচনায় হাত দেন তবে কিন্তু ফল আশাপ্রদ না হতে পারে। মোক্ষ যদি হয়ে ওঠে লোভের বস্তু তবে তাতে মোক্ষলাভ ঘটে না, ব্রহ্মাস্বাদ আর সাংসারিক সুখের ভিতর ভেদরেখাটা

চৈতন্য থেকে মুছে যায়। শিল্পকে মুক্তির পথ বলে ভেবে নিলে এই বিপদটা ঘটতে পারে, ধর্মগুরুদের কারও কারও এমন আশঙ্কা তো সংসারের অভিজ্ঞতা দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। যখন ধনীর গৃহে সুখের সন্ধানে নিয়মিত মজলিস বসে তখন জলসা হয়ে উঠবে প্রমোদের মেলা এই সম্ভাবনা তুচ্ছ থাকে না। এইভাবে জন্ম নেয় এক ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত সংস্কৃতি। কবি নিজে যখন হয়ে ওঠেন এই বিলাসী সংস্কৃতির সচেতন সেবক তখন হয় তো গৃহিনীর গঞ্জনা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পান, কিন্তু দেখা দেয় কাব্যের স্বধর্মভ্রষ্ট হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

কাব্যের স্বধর্ম বলতে এখানে কীসের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে ? কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে আদি বিস্ময়বোধের কথা। সেই বোধ নিয়ে মানুষ যা দেখে তাতেই থাকে এক বিশেষ উজ্জ্বলতা, বিজ্ঞানীরা প্রথম আবিষ্কারের মতো, যথার্থ প্রেমের মতো অথবা হঠাৎ দেখা উড়ন্ত বলাকার মতো। সেই উজ্জ্বল অভিজ্ঞতাকে কবি ধরতে চান শব্দে বাক্যে ছন্দে। সংসারে যথেচ্ছ অতিব্যবহারের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে শব্দ হয়ে যায় দ্যুতিহীন, বিবর্ণ। অতিপরিচয়ের ফলে বিশ্ব থেকে হারিয়ে যায় সেই প্রথম আলোর উজ্জ্বলতা। আর এই বিবর্ণ বিশ্বকেই সংসারী মানুষ একমাত্র সত্য বলে ভ্রম করে। কবির ব্রত এই আগ্রাসী বিবর্ণতা থেকে শব্দ ও বিশ্বকে উদ্ধার করা। উদ্ধারের কাজ কখনও সমাপ্ত হয় না। সার্থক শিল্পী পুরাতন শব্দ ও ভঙ্গিকে যুগে যুগে রূপান্তরিত করে চলেন নবীন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবার সতেজ প্রেরণায়। নিষ্প্রাণতার স্তূপ ঠেলে শিল্পী বার বার এগিয়ে যান প্রাণের প্রদীপ নতুন করে জ্বালাতে শব্দ ও রেখার নব নব গঠন ও বিন্যাসে।

কবি ধর্ম প্রচার করেন না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তাঁর স্বধর্মের বিরোধ নেই। আত্মপরিচয়কে নতুনভাবে আবিষ্কার করাই প্রধান কথা। সঙ্গীতই একমাত্র পথ নয়, বিদ্বেষমুক্ত মন নিয়ে যে কোনও কর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলে তাতেই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে। মানুষ যখন তার আত্মপরিচয়কে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা অথবা অতি অভ্যস্ত সাংসারিকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখে তখন তার অন্য যাই ঘটুক না কেন, মুক্তি ঘটে না। যেমন পল্লীপ্রকৃতিতে দোষ নেই, দোষ আছে 'গ্রাম্যতা' নামে নিষ্প্রদীপ জীবনে, তেমনই সংসারবাসে দোষ নেই, দোষ আছে বিশ্ববিমুখতায় আর অহংকেন্দ্রিক অতি ইচ্ছার বন্ধনে। 'সুখ' নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আনন্দ'ই মানুষকে অন্ধতা থেকে মুক্তি দেয়। মুক্তিকাম মানবতাবাদ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। এরই স্পর্শে মানুষের চেতনা জড়ত্ব থেকে মুক্তি পায়, এরই আহ্বানে ব্যক্তির বিকশিত আত্মা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়।

'আনন্দ' শব্দটা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন উপনিষদ থেকে, 'সুখ' সংসার থেকে। নিজের চিন্তাকে পরিস্ফুট করবার জন্য এই দুয়ের ভিতর তিনি পার্থক্য করেছেন। শব্দার্থের

এই বিভেদ করা হয় না সর্বত্র, কিন্তু করা সম্ভব। "আমি যখন ছিলেম অন্ধ / সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ।" আমরা আমাদের মতো করে পার্থক্যটা বুঝে নিতে চেষ্টা করব।

ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে নানা রকমের অনুভব আমরা লাভ করি। সব অনুভবে শরীর খুশি হয় না, খুশি হলে তাকে বলে সুখ অথবা আরাম। যেমন, শীতের সন্ধ্যায় আগুন থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসবার অভিজ্ঞতাটা আরামের। টক ও মিষ্টির একটা মিশ্রণ আছে যেটা রসনার কাছে সুখকর। যেসব বস্তু তাৎক্ষণিকভাবে সুখকর তার বাইরে আরও কিছু আছে যা থেকে ভবিষ্যতে সুখ লাভের সম্ভাবনা থাকে। সম্ভাব্য সুখের প্রতিশ্রুতিবাহক এইসব বস্তুও প্রত্যাশার সূত্র ধরে সুখকর হয়ে ওঠে। যেমন, হঠাৎ মোটা মাইনের চাকরি পাবার খবরটা সুখের, লটারি জেতার অভিজ্ঞতাটাও সেই রকম।

এর বাইরে আছে অন্য অভিজ্ঞতা, এরা ভিন্ন জাতের। প্রতিদিনের জীবনে এরা আসা-যাওয়া করে। তবু এরা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। একটু দূরে গাছের ডালে হঠাৎ চোখে পড়ল কোনও অচেনা পাখি। তার কাছ থেকে কোনও প্রত্যাশা নেই আমার। তবু মনটা কী জানি কেন খুশি হয়ে উঠল। এই খুশিটা একেবারেই লটারি জেতার অভিজ্ঞতার মতো নয়। আমাদের মনের ধর্মে তবে এমন কী আছে যা দিয়ে এর ব্যাখ্যা সম্ভব?

জ্ঞানতৃষ্ণা কী বস্তু? কোনও বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভ করতে চাই, কিছু জানতে চাই, সোজাসুজি ব্যবহারিক কারণে। অর্থাৎ জানাটা আমাদের কাজে আসে, সাংসারিক অর্থেই কাজে লাগে। বাক্সটা খোলা যাচ্ছে না, আমরা জানতে চাই কীভাবে খোলা যাবে; অসুখ করলে জানতে চাই কোন ওষুধে অসুখ সারবে। এসব ক্ষেত্রে জানতে চাইবার কারণটা অতি স্পষ্ট, অধিক ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞান সরাসরিভাবে কাজে লাগে না, তবু ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে এই সম্ভাবনা স্পষ্ট। সেখানে জিজ্ঞাসার একটা ব্যবহারিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োগের অভিলাষের বাইরেও যেন অকারণে জানবার একটা ইচ্ছা মানুষের ভিতর কাজ করে যায়। এইখানেই প্রশ্ন। "পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে।" হয়তো এটা জানবার কোনও জৈব প্রয়োজন নেই। তবু ব্যাকুল প্রশ্ন। কেন? শুধু পথের শেষ নিয়ে জিজ্ঞাসা নয়, আরও ছোট ছোট কত কিছু নিয়ে অকারণে প্রশ্ন, শিশুর মতো। কেন? এই যে জানবার ইচ্ছা, প্রত্যক্ষ কারণের বাইরে, এই তো বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসা।

শুদ্ধ জাগ্রত চেতনার এটাই ধর্ম। বাইরে যা-কিছু আছে তাকে, ওই ছোট পাখিটাকেও, মানুষ জাগ্রত চেতনার ভিতরে পেতে চায়। আলোর ধর্ম যেমন ছড়িয়ে পড়া, চেতনারও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সেই রকম। সাংসারিক সুখসন্ধানী মন প্রয়োজনের সীমানার ভিতর কাজ করতে এমনই অভ্যস্ত যে, চেতনাকে সে ওইভাবেই বুঝে নিতে

চায়। সংসারী মানুষের এই অভ্যাস। অভ্যাসের এই গণ্ডির ভিতর চেতনাকে, অতএব মানুষকেও, সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়। চেতনা সীমানা ভাঙতে চায়, নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়, এইভাবেই বিশ্বকে সে যথাসম্ভব নিজের ভিতর পায়। এই দেওয়া ও পাওয়াতেই তার আনন্দ, শুদ্ধ যোগের আনন্দ। আত্মবোধের সঙ্গে অধ্যাত্মবোধের এইখানে ভেদ।

আত্মবোধও অপরকে চায়, কিন্তু কী ভাবে ? বাসনার একটি ছোট বৃত্ত রচনা করে অপর সবাইকে সে যথাসাধ্য তার অধীনে নিয়ে আসতে চায়। বাসনায় দোষ কী ? সুখে দোষ কী ? দোষ নেই, যতক্ষণ সে বাধা হয়ে না ওঠে অন্যের সুখের পথে অথবা নিজেরই কোনও মহত্তর প্রাপ্তির পথে। অধ্যাত্মবোধ সীমাবদ্ধ আসক্তির গণ্ডি ভেঙে প্রসারিত হতে চায় বৃহতের মধ্যে। আত্মবোধ ভয়ে ভয়ে থাকে, এই বুঝি কিছু তার মুঠোর বাইরে চলে গেল। অধ্যাত্মবোধ বিশ্বকে দেখে অন্য দৃষ্টিতে।

কী সেই দৃষ্টি ? পার্থক্যটা বোঝাবার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। জীবনের প্রতি এক প্রবল আসক্তি নিয়ে ব্যক্তি বড় হয়ে ওঠে। এই জৈব আসক্তি প্রকৃতিরই দান, একে এককথায় অযৌক্তিক বলা যাবে না। এরই জোরে জীবনের পথে নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে ওঠে মানুষ। মুশকিল অন্যত্র। প্রকৃতির বিধানে আকস্মিকতার উপদ্রব সত্ত্বেও মোটের ওপর একটা মাত্রারক্ষার ব্যাপার আছে। জৈব আসক্তি অন্ধ, কিছুই ছাড়তে জানে না। শুদ্ধ অধ্যাত্মবোধ জীবনের প্রতি আসক্ত নয় কিন্তু শ্রদ্ধাশীল, সেই শ্রদ্ধা ছড়িয়ে আছে বিশ্বময় চেতনার যে অনন্ত প্রবাহ তারই প্রতি। এরই ফলে কিন্তু ঘটে যায় অনুভবের বিস্ময়কর এক পরিবর্তন। মৃত্যু হারায় তার বিভীষিকা। যুক্তি দিয়ে এই আশ্চর্য অনুভবকে খণ্ডন করবার চেষ্টা বৃথা।

মৃত্যু ও জীবনের ভিতর বিরোধ নেই, এটাই 'পূর্ণ' চিন্তার কথা। এখন থেকে হাজার কেন মাত্র শত বৎসর আগেও যদি মৃত্যুর ধারা অকস্মাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত তবে এই পৃথিবীতে আজ নবজাতকের জন্য পা রাখবার মতো স্থান খুঁজে পাওয়া কঠিন হত। মৃত্যুই নবজীবনের জন্য স্থান রচনা করে চলেছে। অন্ধতা কাটিয়ে শান্তভাবে একথা জানবার পরও মৃত্যুতে মানুষ শোকগ্রস্ত হবে, কিন্তু বিশ্বের বিধানের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সেই শোকে একটা শুচিতা রক্ষা পাবে। বিশ্বের পটে জীবনের ছবিকে স্থাপন করে অধ্যাত্মবোধ মানুষকে উদ্ধার করে ক্ষুদ্র ভয়ের বন্ধন থেকে। আত্ম মুক্তি খুঁজে পায় বিশ্বচেতনায়। মুক্তিতে আনন্দ। মুক্তিমুখী জীবনদর্শনই শ্রেয়, বিশ্বের পক্ষে, ব্যক্তির পক্ষেও।